International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-XI, Issue-I, January 2025, Page No.31-38
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i1.005

‘নষ্টনীড়ে’র শিল্পরীতিতে নঞর্থক বাক্যের ব্যবহার

অনন্যা নস্কর
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2025; Accepted: 26.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore's short story ‘Nashtanir’ is a nuanced exploration of human relationships, emotions, and societal expectations, set against the backdrop of colonial Bengal. Written in 1901, the story focuses on Charulata, a lonely housewife, whose emotional and intellectual cravings are unmet by her work-absorbed husband, Bhupati. This gap leads her to form a deep bond with Bhupati's cousin, Amal. What begins as a seemingly innocent relationship gradually evolves into a complex emotional entanglement, challenging the boundaries of familial and societal norms.

Highlighting her intellectual frustrations and emotional isolation. The subtle emotional development between Charulata and Amal, marked by unsaid words and unexpressed emotions, creates a narrative that is rich in psychological depth.

Rabindranath Tagore's narrative style and his exploration of the subtle and often unspoken conflicts within personal relationships.Tagore employs a third-person omniscient narrator to explore the thoughts and feelings of his characters, particularly Charulata's complex emotional landscape. Tagore’s use of silence and pauses in dialogues reflects the internal struggles of the characters, making the unspoken as significant as the spoken. This nuanced portrayal of emotions imbues the story with a poetic quality.

Symbolism is another key stylistic feature in ‘Nashtanir’. lyrical language combined with a focus on the emotional subtleties of human relationships, gives the story its enduring beauty.

Keywords: Rabindranath Tagore, ‘Nashtanir’, Symbolism, Sentence Structure, Stylistic.

‘নষ্টনীড়’ গল্পটি রবীন্দ্র রচনার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ‘নষ্টনীড়’ ছোটগল্পটি প্রথমে ‘ভারতী’ পত্রিকায় বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ১৩০৮ সালে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন একে উপন্যাস হিসেবে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। পরবর্তী সময় হিতবাদী কার্যালয় থেকে ১৩১১ সালে প্রকাশিত ‘রবীন্দ্রগ্রন্থাবলী’- এতে প্রথম ‘নষ্টনীড়’ সংকলিত হয়। হিতবাদী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এই

রবীন্দ্রগ্রন্থাবলীতে 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পের বিভাগে সংকলিত হয়নি, একে উপন্যাসের বিভাগে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল। এরপরে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে 'গল্পগুচ্ছ' প্রকাশিত হয়। সেই 'গল্পগুচ্ছে'র পঞ্চম খণ্ডে 'নষ্টনীড়' সংকলিত হয় ছোটগল্প হিসেবে। অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন -

'শব্দ সংখ্যা আনুমানিক চৌদ্দ হাজার, পরিচ্ছেদ সংখ্যা ২০] আকারে ছোট নয় তবে প্রকারে গল্প'[i]

গল্পটিতে সম্পর্কের জটিলতার সাথে সাথে তৎকালীন সমাজের পরিকাঠামো কিভাবে সাধারণ মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলছে তাকেও নির্দেশিত করে। তৎকালীন সমাজের এমন একটি অবস্থা গল্পটিতে উপস্থিত হয়েছে যেখানে নারী শিক্ষার প্রচলন সমাজের শিক্ষিত উচ্চবিত্তদের মধ্যে প্রচলিত হতে শুরু করেছে। কিন্তু এর ফলে নারীর মানসিক জগতে যে চেতনা উন্মেষন ঘটেছে, তার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে, নিজস্ব ভাবনা ক্ষেত্রে যে চাহিদা, তা পূরণ করার মত পরিবেশ সে তার অন্তর্ভুক্ত থেকে পাচ্ছে না। গল্পটি ঘটনা বহুল নয়, গল্পটিতে সম্পর্কে টানাপোড়েনের বিষয়টিকে রবীন্দ্রনাথ ভীষণ দক্ষতার সাথে চিত্রিত করেছেন। গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব প্রকাশে অসাধারণ। সব চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব গল্পটিতে কমবেশি প্রকাশিত হয়েছে নিপুণভাবে, কিন্তু গল্পটির মনস্তাত্ত্বের ঘাত প্রতিঘাত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রিত হয়েছে চারুলতার মাধ্যমে। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন-

> 'যেখানে কাহিনীর সরলতম সূত্রই যথেষ্ট মনে হয়, ঘটনার জটিলতার কোনো প্রয়োজন থাকে না,পাত্রপাত্রীর আন্তরিক বেগেই রচনাটি সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে,যেমন হয়েছে "কাবুলিওয়ালা"-য় কি তার চেয়েও বেশি নষ্টনীড়ে। পিতৃহৃদয়ের বিরহস্বর্গে পৌঁছাবার পথে ঐ যে একবার জেলখানাটা ঘুরে আসতে হলো,"কাবুলিওয়ালা" গল্পের এটুকুই দুর্বলতা; কিন্তু নষ্টনীড়ের স্বচ্ছ ধারাটি কোনো উচ্চকণ্ঠ ঘটনা দ্বারা একবারও ঘোলা হয়ে ওঠেনি;'[ii]

সাহিত্যে কোনো রচনার নামকরণ তার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত, ব্যঞ্জনাময়, তাই সাহিত্যে রচনার নামকরণ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। সাহিত্যিকের মনোভাবের সংহত প্রকাশ হয় কোনো রচনার নামকরণের মধ্যে দিয়ে।

'নষ্টনীড়' নামকরণে রবীন্দ্রনাথ 'নীড়' শব্দের শান্তির ব্যঞ্জনা অক্ষুন্ন রেখে তার আগে 'নষ্ট' শব্দটি যুক্ত করে ধ্বনিগতসাম্য বজায় রাখলেন, গড়ে তুললেন ছন্দময়তা অথচ সৃষ্টি হল অর্থের প্রচণ্ড বৈপরীত্য। (গল্পটি ইংরাজিতে 'The Broken Nest' নামে অনুবাদ করা হয়েছে।)

'নীড়' বলতে পাখির বাসাকে বোঝানো হয়। 'ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,'[iii] নিয়ে সুখী পরিবারের প্রতীক হল নীড়। 'নষ্টনীড়' নামকরণে গল্পটির স্বরূপ কাব্যিক ব্যঞ্জনা নির্মমভাবে প্রকাশিত। 'নষ্টনীড়' গল্পের শিল্পরীতি বহু সমালোচক দ্বারা প্রশংসিত। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন —

'কিছু না বলে যে কতখানি বলা যায় নষ্টনীড় তার বিস্ময়কর উদাহরণ।'[iv]

এই গল্পের শিল্প উৎকর্ষতার অন্যতম দৃষ্টান্ত হল এর অন্তিম পঙক্তি। ছোট গল্পের সংযম, স্রষ্টার নিদারুণ দায়বদ্ধতা আর কাব্যিক ব্যঞ্জনার প্রকাশ- 'চারু বলিল, " না থাক্ " বাক্যে। অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ বলেছেন —

'... 'নষ্টনীড়' -এর অন্তিম পঙক্তি মহাপ্রতিভাধর গদ্যশিল্পীর পক্ষেই রচনা করা সম্ভব।'[v]

রচনাশৈলীকে বলা হয় সাহিত্যিকের নির্বাচন, এঙ্কভিস্ট বলেছেন - 'style as the choice between alternative expression.' যে বিষয়টি নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করছেন সেই বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে এবং লেখকের বক্তব্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে শিল্পশৈলী গড়ে ওঠে। আবার লেখকের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার দ্বারাও তাঁর সাহিত্য প্রভাবিত হবে কখনো সচেতন ভাবে তিনি সেই অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেন কখনও অসচেতন ভাবে তা এসে পড়ে। ভাষাবিজ্ঞানী 'মিলিচের মতে রচনা ব্যাপারটি একাধারে সচেতন এবং অচেতন দুই-ই, তবে রচনার প্রকার বিশেষে দুয়ের মাত্রাগত ভেদ হতে পারে।'[vi]

'নষ্টনীড়ে'র সমাপ্তি বাক্যের এই সর্বগ্রাসী শূন্যতার প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে গোটা গল্প জুড়ে। যে নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নীড় তারই নঞর্থক বাক্যে শেষ হয়েছে গল্প, আর যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নারীর সামাজিক স্বীকৃতি ও সাংসারিক বন্ধনের সূত্র সেই পুরুষের কথা বলতে গিয়ে আর একটি না-বাচক বাক্য দিয়ে গল্পের সূচনা।

'ভূপতির কাজ করিবার কোনো দরকার ছিল না।'

সাধারণ মানুষ কাজ করে জীবনধারণ করার জন্য। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কাজ করার বাধ্যবাধকতা ভূপতির নেই। ধন, সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা, সুখীগৃহ, স্ত্রী, পরিজন সবই ভূপতির আছে। তার কাজ করা আসলে নিজের যোগ্যতাকে জাহির করা ও কোনো একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা, কিছুটা শখপূরণ। ভূপতির কাজ করার বিপ্রতীপ একটি অবস্থানে রাখা হল চারুকে।

'ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না।'

পরবর্তী বাক্যে চারুর জীবনযাত্রার চিত্র অঙ্কিত হল পরস্পর বৈপরীত্যযুক্ত শব্দের পাশাপাশি ব্যবহারে।

'ফলপরিণামহীন ফুলের মত পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল।'

'ফলপরিণামহীন ফুল' আর 'পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতা' চারুর 'চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির' একঘেয়ে জীবনের অপ্রয়োজনীয়তাকে প্রকট করে তুলেছে।[vii] পরের বাক্যেই বলা হল —

'তাহার কোনো অভাব ছিল না।'

ধনীগৃহিনীর অভাব না থাকার বিষয়টি উল্লেখ করা মাত্র তা হয়ে ওঠে দ্ব্যর্থক ভাবের বাহক। বাক্যগুলিকে পরপর সাজালে দেখা যায় —

1) ধনীগৃহে চারুলতার কোনো কর্ম ছিল না।
2) ফলপরিণামহীন ফুলের মত পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল।
3) তাহার কোনো অভাব ছিল না।

দুটি না-বাচক বাক্যের মাঝে হ্যাঁ-বাচক বাক্যটি সজ্জিত হয়ে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে এবং চারুর নিষ্ফলতাকে প্রকট করেছে। এর পরের অনুচ্ছেদে ভূপতি ও চারুর দাম্পত্য সম্পর্কের রূপটি প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক আবার একটি নঞর্থক বাক্য ব্যবহার করলেন, স্পষ্ট করে দিলেন স্বামীর কাছে চারুর অবস্থানটি —

'চারুলতার সে সুযোগ ছিল না।'

পরবর্তী সময় ভূপতি ও অমলের সাথে চারুর মানসিক সম্বন্ধ প্রকাশিত হয় এই বাক্যে —

'ভূপতি চারুলতার প্রতি কোনো দাবি করিত না, কিন্তু সামান্য একটু পড়াইয়া পিসতুত ভাই অমলের দাবির অন্ত ছিল না।'

এই জটিল বাক্যে চারুর প্রতি দাবিকে কেন্দ্র করে একদিকে ভূপতি অন্য দিকে অমল, দুজনে দুই বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করে। বাক্যটির প্রথম অংশ না-বাচক, দ্বিতীয় অংশটিও তাই, তবে দ্বিতীয় অংশের ব্যঞ্জনা নঞর্থক নয়।

1) ভূপতি চারুলতার প্রতি কোনো দাবি করিত না
2) পিসতুত ভাই অমলের দাবির অন্ত ছিল না '

প্রথমাংশে ভূপতির কথা,শেষাংশে অমলের। চারুর সাথে অমলের সম্পর্কের জটিল সমীকরণের আভাস এই বাক্যের মধ্যে প্রতিফলিত।

চারুর সাথে অমলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে 'ভূপতির অন্তঃপুরে' যে ফাঁকা স্থান ছিল সেইখানে বিলিতি আমড়া গাছের তলায় বসে চারু অমলের বাগান তৈরির পরিকল্পনা। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'বাড়ির ভিতরে আমাদের যে-বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশি বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেলগাছ তাহার প্রধান সংগতি।'[viii] ব্যক্তিগত স্মৃতির প্রসঙ্গ গল্পে এসেছে। বাগান তৈরিকে কেন্দ্র করে চারু এবং অমলের ' আকাশ কুসুম ' কল্পনা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। এই অংশটির মধ্যে কোনো নঞর্থক বাক্য নেই।

এই কল্পনার রাজ্যে চারু 'সেকালের রাজকন্যার মতো।' বর্তমান সময় থেকে সুদূর অতীতের কোনো এক অনির্দিষ্ট সময়ে তাদের বাগানের পরিকল্পনা রূপ লাভ করেছে। অতীতের প্রতি এই টান বর্তমানকে দূরে সরিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই অতীত প্রিয়তা বহুবার এসেছে —

"দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।"[ix]

আবার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রিয়াকে অতীতের মাঝে দেখি —

"পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চ'লে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;"[x]

বাক্যগুলিকে অমল এবং চারুর উক্তির আকারে সাজালে দেখা যায় —

1) অমল: 'সে কালের রাজকন্যার মতো তোমাকে নিজের হাতে গাছে জল দিতে হবে।'
2) চারু: 'আর ঐ পশ্চিমের কোণটাতে একটা কুঁড়ে তৈরি করে নিতে হবে,হরিণের বাচ্চা থাকবে।'
3) অমল: 'আর-একটা ছোটোখাটো ঝিলের মতো করতে হবে, হাঁস চরবে।'[xi]
4) চারু: 'আর তাতে নীলপদ্ম দেব,'[xii]
5) অমল: 'সেই ঝিলের উপর একটি সাঁকো বেঁধে দেওয়া যাবে আর ঘাটে একটা বেশ ছোটো ডিঙি থাকবে।'[xiii]

বাগানের পরিকল্পনা ভবিষ্যতের, কল্পনার ক্ষেত্র অতীতের, বাস্তব এখানে ব্রাত্য। যতক্ষণ কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করছিল ততক্ষণ নঞর্থক বাক্যের প্রয়োজন পড়েনি। যখনই বাগানের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য 'এস্টিমেট', টাকা, হিসাবের কথা উঠল তখনই আবার শুরু হল হ্যাঁ - না এর বুনন।

'ভূপতি তো বাড়িতে কোথায় কী হইতেছে তাহা চাহিয়া দেখে না ;'

ভূপতি আর ' না-বাচক ' বাক্য এল এক সাথে।

বাগানের পরিকল্পনা করতে করতে 'কাব্যকুসুমের চাষ আরম্ভ হইল'। সংসার নীড়ের বাইরে আর একটি নীড় রচনা করেছে চারু, লেখক বলেছেন 'সাহিত্যনীড়' —

> 'চারু আরামের জন্য অতিনিভৃতে যে- একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যনীড় রচনা করিতেছিল হঠাৎ-প্রশংসা শিলাবৃষ্টির একটা বড়োরকমের শিলা আসিয়া সেটাকে একেবারে স্খলিত করিবার জো করিল।'

অমল লেখক হিসেবে সমাজে মর্যাদা পাওয়ার সাথে সাথে মন্দাকে কেন্দ্র করে চারু ও অমলের সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট অবয়ব ধারণ করে। চারুর লেখা প্রশংসা করে সমালোচনা প্রকাশ হওয়ায় অমল অভিমান করে মন্দাকে যে লেখা পড়ে শোনায়, তা চারু আগে শোনেনি। অমল লিখেছে —

> 'মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়, অনন্ত জগৎ সংসার সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় না।'

এই বাক্যটি গল্পে দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এটিই একমাত্র বাক্য যেটি দুইবার ব্যবহৃত হল। মানব মনের বদ্ধতা আর জগৎ সংসারের প্রবহমানতা; বন্ধন আর গতিময়তা - চারু ও অমলের জীবনের অনিবার্য ভবিষ্যৎ পরিণাম।

প্রথমবার বাক্যটি সশব্দে উচ্চারণ করেছে অমল, মন্দাকে শোনাতে গিয়ে, চারু এটি আড়াল থেকে শুনেছিল। দ্বিতীয়বার বাক্যটি চারুর দিক থেকে প্রতিফলিত। অমল সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছিল, চারু তা চায় নি। 'শেষের কবিতা'য় অমিত ভেবেছে —

> 'পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়।'[xiv]

চারু এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সশব্দে ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজেকে রুদ্ধ করল। অমল চারুর দরজার কাছ দিয়ে যাবার সময় 'একবার চাহিয়া দেখিল'। একটি ঘটনাকে পাঠক দুজনের দিক থেকে দেখল। অমলের চলে যাওয়া চারুর দিক থেকে বর্ণিত হল -'ফিরিয়াও তাকায় না' এর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হয়ে —

> 'অমল তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল - একবারও থামিল না।'

'বন্ধন-অসহিষ্ণু' অমলের ক্ষেত্রে অনিবার্য ছিল এই প্রবহমানতা। 'গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী'[xv] চারুর জন্য অনিবার্য হয়ে উঠবে স্থবিরতা।

অমল ও চারুর মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝে হঠাৎ ভূপতি এসে পড়ায় চারুর মানসিক আবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ভূপতি বহির্বিশ্ব থেকে আঘাত পেয়ে অন্তঃপুরে আশ্রয় চাইল।

'এ দিকে এই পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি ভূপতি কোনো আসন্ন ঋণের ...'

ভূপতিকেই পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হল। চারু ও ভূপতির মাঝে অমল তৃতীয় ব্যক্তি নয়, বৈবাহিক সম্পর্কের দিক থেকে নয়, আত্মিক দিক থেকে এই বিষয়টি নির্ধারিত হল।

> 'সন্ধ্যার সময় আঁধারের সূত্রপাত দেখিলেই পাখি যেমন করিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসে, ভূপতি সেই রূপ ...চারুর কাছে চলিয়া আসিল।'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ভূপতি ফিরে এল; তবে নিজের থেকে নয়, বাইরের আঘাতে জর্জরিত হয়ে। কিন্তু ততদিনে তার নীড়ের অবস্থা কেমন হয়েছে তা লেখক বর্ণনা করলেন দুইটি নঞর্থক বাক্যের মাধ্যমে -

1) ...স্ত্রীর ওপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না,
2) স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো ... হাওয়ায় নেবে না,
3) তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙচুর .... ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।

'সাধারণ সংস্কারে'র বিপরীতে একগুচ্ছ নঞর্থক বাক্য দিয়ে ভূপতির বদ্ধ ধারণাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হল।

চারুর সাথে অমলের বিচ্ছেদে সহজ বিদায়ের সুর ছিল না। অমলের আচরণ হয়ে উঠেছিল জটিল। 'শেষের কবিতায়' লাবণ্য বলেছিল —

> 'যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।'[xvi]

অমল চলে যাবার সময় চারু কেবল বলতে পেরেছিল —

> 'চিঠি লিখবে তো, অমল'

অমলের চিঠিকে কেন্দ্র করেই ভূপতির কাছে তার দাম্পত্য সম্পর্কের স্বরূপটি প্রকাশিত হবে। অমল বিলেত যাবার পথে তিনটি জায়গা থেকে চিঠি পাঠিয়েছিল - এডেন, সুয়েজ ও মাল্টা। তিনটি চিঠিই এসেছে ভূপতির নামে।

1) প্রথমে এডেন হইতে ভূপতির নামে একখানা চিঠি আসিল,তাহাতে অমল বউঠানকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে;
2) সুয়েজ হইতেও ভূপতির চিঠি আসিল,বউঠান তাহার মধ্যে প্রণাম পাইল।
3) মাল্টা হইতে চিঠি পাওয়া গেল, তাহাতেও পুনশ্চ - নিবেদনে বউঠানের প্রণাম আসিল।
4) চারু অমলের একখানা চিঠিও পাইল না।

তিনটি বাক্যের সমান্তরলতা ও বৈপরীত্য ঘটনা প্রবাহের দিক নির্দেশ করে দিয়েছে। এবং চারুর চিঠি না পাওয়ার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছে। এডেন ও সুয়েজ থেকে ভূপতির নামে চিঠি এসেছে। মাল্টা থেকে শুধু 'চিঠি পাওয়া গেল' - নাম উল্লেখের আর প্রয়োজন নেই, পাঠক জেনে গেছে ভূপতির নামেই চিঠি এসেছে। এডেন ও সুয়েজ থেকে আসা চিঠিতে বউঠানের জন্য 'প্রণাম নিবেদন' হল ও 'প্রণাম পাইল'। মাল্টা থেকে যে চিঠি এল তাতে মূল চিঠিতে বউঠানের স্থান আর নেই, পুনশ্চতে তার 'প্রণাম আসিল' মাত্র। এই তিনটি বাক্যে বারেবারে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অথবা সমজাতীয় শব্দ পুনরাবৃত্ত হয়েছে। চিঠি পাওয়ার

ক্রমটি সম্পূর্ণ হয় এবং 'চিঠি' ও 'প্রণাম' এই দুয়ের আসার বৃত্তটির শূন্যতা প্রকট হয়ে ওঠে ' চারু অমলের একখানা চিঠিও পাইল না' — এর মধ্যে দিয়ে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে চারু ভূপতিকে কৌশলে বোনের বাড়ি পাঠায়। ভূপতির অনুপস্থিতিতে গয়না বেচে অমলকে টেলিগ্রাম করার জন্য। এই সময় চারুর কথা অসংলগ্ন ও তার অব্যবস্থিত মনের পরিচয়ক।

5) সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ কথার মধ্যে চারু অত্যন্ত উদাসীনভাবে শান্তস্বরে তাহার স্বামীকে কহিল, "আচ্ছা দেখো, বিলেতে একটা টেলিগ্রাফ ক'রে জানলে হয় না, অমল কেমন আছে ?"
6) চারু। ওঃ, তবে কাজ নেই। আমি ভাবছিলুম,বিদেশে আছে, যদি ব্যামোস্যামো হয় - বলা তো যায় না।
7) ভূপতি। নাঃ, তেমন কোনো ব্যামো হলে খবর পাওয়া যেত। টেলিগ্রাফ করাও তো কম খরচ নয়।
8) চারু। তাই নাকি। আমি ভাবছিলুম, বড়োজোর এক টাকা কি দু টাকা লাগবে।
9) ভূপতি। বলো কী, প্রায় একশ টাকার ধাক্কা।
10) চারু। তা হলে তো কথাই নেই।

অমল চলে যাবার পর চারুর আচরণ জটিলতর হয়ে উঠেছে ভূপতির জীবনযাত্রা ও আচরণ পরিবর্তনে। চারুর প্রতি ভূপতির এই আকস্মিক অতিরিক্ত মনোযোগের জন্য চারু সেই সময় প্রস্তুত ছিল না। যখন চারুর একলা থাকার প্রয়োজন খুব বেশি ছিল তখন তার চির অভ্যস্ত জীবন যাত্রার মাঝে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে ভূপতি স্বামী হওয়ার দাবি নিয়ে বসল। চারু ভেবেছে —

'ভূপতি আর কিছু অবলম্বন করে না কেন। আর একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন।'

ভূপতি স্ত্রীর চেয়ে খবরের কাগজের কর্মময় জীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল, তাকে অবলম্বন করেছিল। চারু বিয়ের পর বারো বছর নিজেকে এই জীবনের সাথে মানিয়ে নিয়েছিল। ভূপতি 'বহিঃজগৎ থেকে আঘাত পেয়ে' যখন স্ত্রীকে অবলম্বন করার কথা ভেবেছে ততদিনে চারুর মাঝে আশ্রয় দেবার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে গেছে। গল্পের শুরুতে স্বামীর কাছে চারুর অবস্থান সম্পর্কে লেখক জানিয়ে ছিলেন —

'কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল।'

গল্পের শেষে ভূপতি যখন নীড়ে ফিরেছে তখন চারুর মধ্যে তাকে শান্তি দেবার মতো কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নারীর কাছে পুরুষের আশ্রয় লাভের বিষয় অনেক সময় ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের নাটকে। অধ্যাপক সৌমিত্র বসু বলেছেন —

'পুরুষ চরিত্রটি সেখানে শারীরিকভাবে আশ্রয় দেয় নারীকে, আর নারী
তাকে দেয় মানসিক আশ্রয় ... ক্রমে রবীন্দ্রনাথের নাটকে গুরুত্ব পেতে
লাগল নারীর কাছে পুরুষের আশ্রয় পাবার বিষয়টি।'[xvii]

এই গল্পেও ভূপতি আশ্রয় চেয়েছে চারুর কাছে, কিন্তু চারু আশ্রয় দিতে পারেনি। চারুর এই অক্ষমতার জন্য সে একা দায়ী নয়। একটি জটিল বাক্যে পাঁচ বার ' নাই' আর অবশেষে 'না' ব্যবহার করে চারুর মানসিকতা ও তার দাম্পত্য সম্পর্কের এই পরিণতির কারণ বিবৃত করেছেন লেখক। তিনি চারুকে দোষারোপ করেননি।

11) ভূপতির চিত্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্যন্ত চারুকে কখনও করিতে হয় নাই ;

12) ভূপতি তাহার কাছে কোন সেবা দাবি করে নাই,
13) কোন সুখ প্রার্থনা করে নাই,
14) চারুকে সে সর্বতোভাবে নিজের প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে নাই ; ...
15) চারুর নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছু যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না।

ভূপতি যখন চারুর থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছে, সেই বিদায় বেলায় চারুও নিজের চরম একাকিত্বের দিকে তাকিয়ে ভীত হয়ে উঠেছে। গল্পের এই শেষ অংশটিতে ভূপতি ও চারুর কথোপকথনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-

> "ভূপতির অসংজ্ঞান মনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হইল অন্যাসক্তা ও তাহার প্রতি বিমুখা নারীর সহচর্যের দুঃসহতার উপলব্ধি এবং তাহার কণ্ঠ হইতে "না" শব্দ সংস্কারবশতই বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চেতন মন জাগ্রত হইয়া এই অচেতন অস্বীকৃতিকে প্রত্যাহার করিল।কিন্তু ইতিমধ্যে চারুও ভাবিবার অবসর পাইয়াছে। সেও তাহার অবচেতন মন হইতে উদগীরিত জৈব সংস্কারের বিরুদ্ধে তাহার ইচ্ছাশক্তি ও ঔচিত্যবোধের প্রতিরোধকে জাগ্রত করিয়াছে এবং ভূপতির উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া তাহার পূর্বতন ভিক্ষাকে প্রত্যাহার করিয়াছে। একই ভাবোচ্ছ্বাস দুই বিপরীত মনোগহন হইতে নিঃশ্বসিত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অতল ব্যবধানকে অভিন্নশব্দবন্ধনে মিলাইয়া দিতে প্রয়াসী হইয়াছে। এই সমক্ষণে উচ্চারিত দুইটি "না" দুইটি চিরবিচ্ছিন্ন সত্তার সীমাহীন শূন্যতাকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছে। সমস্ত উপন্যাসের অবদমিত হৃদয়মন্থনের বিষনির্যাস এই নেতিবাচক ধ্বনি দুইটির মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও চিরন্তন হইয়া রহিল।"[xviii]

গল্পের একেবারে শেষে যখন ভূপতি সব জানার পরে চারুর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চাইছে আর চারু 'দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ' করতে চাইছে সেই সময়ে তাদের কথোপকথনের শিল্পরীতিতে 'হ্যাঁ -বাচক' বাক্যের চেষ্টাকৃত ব্যবহার -

16) বিদায়কালে চারু জিজ্ঞাসা করিল, "কবে আসবে।"
17) ভূপতি কহিল, "তোমার যদি একলা বোধ হয়, আমাকে লিখো,আমি চলে আসবো।"
18) চারু ছুটিয়া আসিয়া ... কহিল, "আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না।"
19) ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল, "না, সে আমি পারিব না।"
20) তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, "চলো,চারু,আমার সঙ্গেই চলো।"
21) চারু বলিল, "না, থাক্।"

এই গল্পের যে অনিবার্য পরিণামের আভাস সমগ্র গল্প জুড়ে এর শিল্পরীতি,বাক্য-বিন্যাস, শব্দনির্বাচন ও তার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশিত।

তথ্যসূত্র :

---

[i] সুকুমার সেন, *'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চতুর্থ খণ্ড'*,কলকাতা, আনন্দ, ২০১৪, পৃ-২৮৩।

[ii] বুদ্ধদেব বসু,*"কাহিনী ও রচনা", "রবীন্দ্রনাথ ও কথাসাহিত্য", 'বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ সমগ্র তৃতীয় পর্ব,'*কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১০, পৃ-২।

[iii] জীবনানন্দ দাশ, *"পাখিরা", 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা',* কলকাতা, দে'জ, ২০১৪, পৃ-৩৬।

[iv] বুদ্ধদেব বসু,*"কাহিনী ও রচনা", "রবীন্দ্রনাথ ও কথাসাহিত্য", 'বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ সমগ্র তৃতীয় পর্ব,'* কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১০, পৃ-২।

[v] তপোব্রত ঘোষ, *'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ'*,কলকাতা, দে'জ, ২০১২, পৃ-১৯৫।

[vi] অভিজিৎ মজুমদার, *'শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্য তত্ত্ব',* কলকাতা,দে'জ, ২০১৪, পৃ-৬৪।

[vii] পরিপূর্ণ বিকাশ আর অন্তর শূন্যতার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'মণিহারা' গল্পের মণিমালিকাকে, লেখক তাকে বলে ছিলেন ' ঘনপল্লবিত অতি সতেজ লতার মত ... ' যদিও চারু আর মণিমালিকার মধ্যে বিস্তর ফারাক তবুও ভূপতি ও ফণিভূষণের ব্যর্থ দাম্পত্যর অবস্থানটি কোনো এক স্থানে এসে মিলে যায়।

[viii] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *'জীবনস্মৃতি',* কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪২১,পৃ-১৮।

[ix] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *"স্বপ্ন", "কল্পনা"*,কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯,পৃ-১৮।

[x] জীবনানন্দ দাশ, *"হায় চিল",'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'*,কলকাতা, দে'জ, ২০১৪, পৃ-৫৬।

[xi] 'আপদ' গল্পে 'হাঁস' নলদময়ন্তীর কাহিনীর সাথে মিশে প্রেমের প্রতীক হিসেবে এসেছে।

[xii] রামায়ণে দুর্লভ হিসেবে নীলপদ্মকে দেখানো হয়েছে। চারুর আকর্ষণ দুর্লভের প্রতি, সহজে ও সস্তায় পাওয়া যায় এমন বাগান সাজানোর উপকরণেও তার প্রবল আপত্তি।

[xiii] 'ঘাট', 'ঝিল', 'ডিঙি' মিলে যে চিত্রটি গড়ে ওঠে সেই একই চিত্র যেন দেখা যায় 'শেষের কবিতায়'।

[xiv] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *"শেষের কবিতা", 'রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড'*,কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭৮, পৃ-৩১৭।

[xv] 'আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন- অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহারপ্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে।' দ্র: *"বিহারীলাল",'আধুনিক সাহিত্য', রবীন্দ্র রচনাবলী,'* ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ-৩৭০।

[xvi] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *"শেষের কবিতা",'রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড'*,কলকাতা, বিশ্বভারতী,১৩৭৮,পৃ-৩৪৭।

[xvii] সৌমিত্র বসু, *"রক্তকরবীর চরিত্র ও গান", 'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী অন্যভাবনায়'*,কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১৫,পৃ-৪০।

[xviii] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *'রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা,'* কলকাতা,ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ২০১০, পৃষ্ঠা ২৫০-২৪৯।

গ্রন্থঋণ:

1. অভিজিৎ মজুমদার, *শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্য তত্ত্ব*,কলকাতা, দে'জ, ২০১৪।
2. জীবনানন্দ দাশ,*জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা*,কলকাতা, দে'জ, ২০১৪।
3. তপোব্রত ঘোষ, '*রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ',* কলকাতা,দে'জ, ২০১২।
4. তপোব্রত ঘোষ, '*কবিমানসী ও সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-কাদম্বরী চর্চা',* কলকাতা,পরম্পরা প্রকাশন, ২০১৮।
5. বুদ্ধদেব বসু, '*বুদ্ধদেব বসু প্রবন্ধ সমগ্র' তৃতীয় পর্ব*,,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১০।
6. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *'রবীন্দ্র রচনাবলী ,দ্বাবিংশ খণ্ড'*;কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৭৮।
7. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *'রবীন্দ্র রচনাবলী,' দশম খণ্ড*, কলকাতা,বিশ্বভারতী, ১৩৭৮।
8. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, '*জীবনস্মৃতি',* কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪২১।
9. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *"কল্পনা",* কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯
10. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, '*রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা,'* কলকাতা,ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ২০১০।
11. সত্যেন্দ্রেনাথ রায়, '*রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ'*;কলকাতা, দে'জ, ২০০৪।
12. সুকুমার সেন, '*বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' চতুর্থ খণ্ড*, কলকাতা,আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪।
13. সৌমিত্র বসু, *'রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী অন্যভাবনায়',* কলকাতা, রত্নাবলী, ২০১৫।